OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 524 - 538
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা প্রবাদের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ড. শ্যামসুন্দর প্রধান
সহযোগী অধ্যাপক, সাগর মহাবিদ্যালয়
Email ID: shyampradhan73@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Language, Sanskrit, Linguistics, Memory, Dialect, Grammar, Folklore, Proverbs.

Abstract

Humans are social creatures. Language is needed for communication and expression. Every country and nation has its own language. Like all countries and nations of the world, Bengalis also have their own language, its name is Bangla language. Through various changes, the ancient Bengali language gradually evolved and became modern. Panini's 'Astadhayi Grammar' has a glorious history of linguistics in our country. But the history of language learning in Bangladesh is not long. Darwin's theory of evolution appears to be as applicable to language as it is to animals. Ferdinand de Saussure gave early direction to linguistics. Later, Sunitikumar Chattopadhyay, Rabindranath, Sukumar Sen, Muhammad Shahidullah, Pareshchandra Majumder, Munir Chowdhury, Abdul Hai etc. practiced linguistics. Linguist Noam Chomsky showed that a generative grammar not only produces grammatical sentences, but also signals the possible syntax of the language. Today many people call the science of linguistics as 'grammar'. The discussion of why or not is descriptive. In ancient times, it was thought that grammar will tell how the language will be, according to the rules. Bengali language is thousands of years old, but grammar is very young. Many people think that the language has lost its fluency due to the difficulty of grammar. This idea is completely wrong. Raja Rammohan Roy was the first Bengali to write a grammar in the Bengali language. The two Bengali grammarians before him were foreigners (Asmumpsao and Halhead). The creation of Bengali grammar based on modern science has been made possible by the tireless work and efforts of many learned linguists and grammarians after Rammohan. And in the light of this, the structure of the Bengali language can be known with its true nature and form. Proverbs are one of the main elements of folk culture, which is a combination of aesthetic feelings and practical needs. It is small in stature but outstanding in terms of money. Although a little lighter and more incoherent than rhymes, its chubby language syntax appeals to our intellect and mind. No such person can be found,Who does not know at least two or four proverbs or apply them in conversation from time to time. Even if the meaning of the proverb is not explained to anyone, the proverb is used by millions of illiterate people of the country. Although Western scholars speak of six qualities of proverbs, it is not limited to these few qualities. So far reliable collections of

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Bengali proverbs have been published, the literary, social, psychological and even economic aspects of Bengali proverbs have been discussed, but the linguistic or grammatical aspects of Bengali proverbs have not been discussed in detail. There is scope for extensive discussion of this in the main article.

Discussion

আফ্রিকার কিছু মানুষ নবজাতক শিশুকে বলে 'কুন্টু' অর্থাৎ বস্তু। কিন্তু সে যখন কথা বলতে শেখে তখন সে আর 'কুন্টু' থাকে না – হয়ে যায় 'মুন্টু' অর্থাৎ একজন ব্যক্তি। বোঝা যায়, এই জনগোষ্ঠীর কাছে শিশুও মানুষ পদবাচ্য নয়, যতক্ষণ না সে ভাষা শিখছে। আর এই ভাষা শেখাই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। অন্যদিকে ভাষা একের সঙ্গে অপরের সংযোগ সাধনের ধ্বনিমাধ্যম। আমাদের দেশে ভাষাচর্চার গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে পাণিনির 'অষ্টাধায়ী ব্যাকরণ'-এ (খ্রি. পূ. ৩৫০-২৫০ অব্দ)। কিন্তু বঙ্গদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়। তবু পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের লেখকদের কলমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে মানবিকবিদ্যার এই বিভাগটি, যেটি মূলত দুটি ধারায় বহমান - একটি তুলনামূলক-ঐতিহাসিক, অন্যটি বর্ণনামূলক। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সভার ভাষণে উইলিয়াম জোনস বলেছিলেন,-

> "সংস্কৃত ভাষা, এর প্রত্ন পরিচয় যাই হোক না কেন, এক বিস্ময়কর সংগঠনমণ্ডিত। এ ভাষা গ্রিকের চেয়ে উৎকৃষ্ট, লাতিনের চেয়ে বিশদ এবং উভয়ের থেকে সুচারুরূপে পরিশীলিত। ... যা সম্ভবত আজ বিলুপ্ত।"[১]

এই একই কথা ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তাঁর 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থে বলেছেন। কিন্তু ইতিহাস জোনসকে স্বীকৃতি দিয়েছে, হালহেডকে দেয়নি। উনিশ শতকে ভাষাবিজ্ঞানের যে সব স্মরণযোগ্য কাজ হয়েছে তার অধিকাংশই জার্মানদের চিন্তার ফসল। ভাষার ইতিহাস রচনার উপর জোর পড়ল এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রাণীজগতের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হল।

ভাষাতত্ত্বের মূল অবস্থান তথা তুলনামূল-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান থেকে সরে এসে নতুন পথের নির্দেশ দিলেন ফের্দিনাঁ দ্য সেস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩)। পাণিনির ব্যাকরণের বর্ণনামূলক পদ্ধতির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেস্যুর পাশ্চাত্যদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় যে আধুনিক যুগের সূচনা করেছিলেন, তাতে পাণিনির বর্ণনামূলক পদ্ধতির পরোক্ষ প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। তিনিই প্রথম ধরিয়ে দেন ভাষার খণ্ড খণ্ড উপাদান মিলে যে অখণ্ড রূপটি সৃষ্টি হয়, সেই অখণ্ড রূপেই ভাষার সামগ্রিক তাৎপর্য রয়েছে। ভাষার উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সার্থকতা বহন করে না। তিনি ভাষার অর্থের দিকটি বাদ দিয়ে তার বহিরঙ্গ গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় সুনীতিকুমার ও রবীন্দ্রনাথ হলেন দু'জন আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। সুনীতিকুমার যেখানে গবেষণা করেছেন ঐতিহাসিক ধারায়, সেখানে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান একজন বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিকের। সুনীতিকুমার প্রচুর তথ্য ও প্রখর বিশ্লেষণী শক্তির সমন্বয়ে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যে গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তার নাম 'The Origin and Development of the Bengali Language'। বইটিকে ভাষার মহাভারত বললে অতিকথন হয় না। সুনীতিকুমার খাঁটি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ লেখার ইচ্ছা থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বইটি। বইটি রচনার ক্ষেত্রে ডানিয়াল জোন্‌সের প্রেরণা যে কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানকে তিনি খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেননি।

সুনীতিকুমারের পর বাংলা ভাষাতত্ত্ব যিনি চর্চা করেন তিনি হলেন আচার্য সুকুমার সেন। তিনি সুনীতিকুমারের উত্তরসূরী হলেও ভাষাচর্চায় তাঁর মৌলিকতা অনস্বীকার্য। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাংলাভাষাতত্ত্বের ঐতিহাসিক বিবরণ তিনিই প্রথম দিয়েছেন। বহু ভাষায় পারঙ্গম ও ভাষাপথিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বিচিত্র বিষয়ে বিচরণ করতে লক্ষ্য করা গেলেও ভাষাতত্ত্ব ছিল তাঁর স্বক্ষেত্র। তাঁর ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজগুলি হল – চর্চাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বাংলা ব্যাকরণ রচনা, ভাষাতত্ত্বের সাধারণ সূত্রগুলি আবিষ্কার, বাংলাভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, Outline of an Historical Grammar of the Bengali Language (1920), বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫), পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিধান, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ প্রভৃতি। ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল - সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ (১৯৭১), বাংলাভাষা পরিক্রমা (২য় খণ্ড), ভারতীয় ভাষার এক সামগ্রিক মানচিত্র, পৃথিবীর ভাষা : ইন্দো-ইউরোপীয় প্রসঙ্গ প্রভৃতি। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও এভাষার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম প্রবর্তক ফের্দিনাঁ দ্য সেস্যুরের দৃষ্টিভঙ্গির নির্দশন রয়েছে তাঁর রচিত দু'টি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে – শব্দতত্ত্ব (১৯০৯)-এর বহু প্রবন্ধ এবং 'বাংলা-ভাষা পরিচয়' (১৯৩৪)। তাঁর রচিত বইগুলি বাংলা ভাষায় হওয়ায়, তা বিশ্বের চোখে পড়েনি।

সিনক্রনিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বাংলাদেশের দু'জন পুরোধা ভাষাতাত্ত্বিক হলেন মুনীর চৌধুরী ও আব্দুল হাই। ১৯৬৫ খ্রিস্টব্দে নোয়াম চমস্কি ও মরিস হালির যৌথ উদ্যগে প্রকাশিত গ্রন্থের (The Sound Patterns of English) আগে মুনীর চৌধুরী ও চার্লস ফার্গুসন বাংলা ভাষার স্বনিমগুলি নির্ধারণ করেছেন, যেটি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে Language পত্রিকায় যৌথ নামে 'The Phonemes of Bengali' গবেষণাটি প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ আব্দুল হাই বাংলা ভাষায় ব্রিটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জন. রুবার্ট. ফার্থের Prosodic analysis পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক। শব্দের ধ্বনিখণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হয় না। একে অন্যকে প্রভাবিত করে কিভাবে একটি সামগ্রিক ছন্দোশ্রী অর্জন করে, এই অভিনব বিশ্লেষণ রীতিতে তা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া মুনীর চৌধুরী বলেছেন, -

"ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আব্দুল হাইয়ের তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণটি মৌলিক এবং সূক্ষ্ম ...।"[২]

বিশ্বের ভাষাতত্ত্বে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার তরঙ্গ এসে পড়ে বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চাতে। এ পথের সবচেয়ে বড় ভাষাতাত্ত্বিক হলেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নোয়াম চমস্কি, যিনি একালের চিন্তা চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। তিনি দেখালেন 'রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্ব' – যার প্রথম কথাই ছিল, ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি সৃজনমূলক ব্যাপার। অর্থাৎ একটি সৃজনশীল ব্যাকরণ কেবলমাত্র ব্যাকরণসম্মত বাক্যই সৃজন করে না, ভাষার সম্ভাব্য বাক্যগঠন সম্পর্কেও সংকেত দেয়। তাছাড়া ভাষাকে তিনি গঠন-সর্বস্বতাবাদীদের মতো শুধু বহিরঙ্গের গঠন বলে গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ বহিরঙ্গ গঠনের ভেতরে যে অর্থগত দিক রয়েছে তাকেও তিনি উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে Syntactic Structures নামে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, সেখানে সৃজনশিলতার দিকটিকে বড় করে দেখালেন। তিনি বলেন মানুষের ভাষাবোধ একটি সহজাত ব্যাপার। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Aspects of the Theory of Syntax নামক গ্রন্থে ভাষার দু'টি দিকের স্পষ্ট স্তর নির্দেশ করলেন – বহিরঙ্গ গঠন (Surface Structure) বা ধ্বনির দিক এবং অন্তরঙ্গ গঠন (Deep Structure) বা অর্থের দিক। বাক্য বিশ্লেষণে তিনি যে রীতি গ্রহণ করেছেন তাতে ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সম্পর্কটি বেশ পরিষ্কার, কিন্তু বাক্যের শব্দগুলির মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্টতার তারতম্য ধরা পড়ে। একটি বাক্যের পদসমূহের এই তারতম্যটি চম্স্কি যে পারম্পর্যের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করেছেন তা একটি বৃক্ষানুরুপ চিত্রের সাহায্যে দেখা যেতে পারে। একটি ইংরেজি ও বাংলা প্রবাদ বাক্যের গঠন নিয়ে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক-

English	বাংলা
The pot calls the kettle black	আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খসখসে
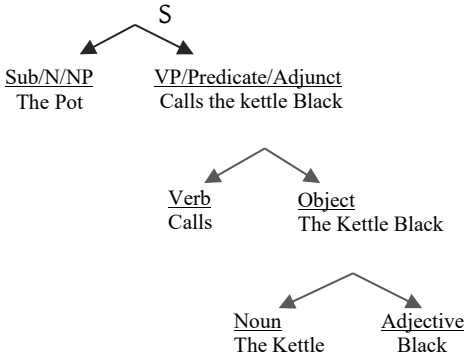	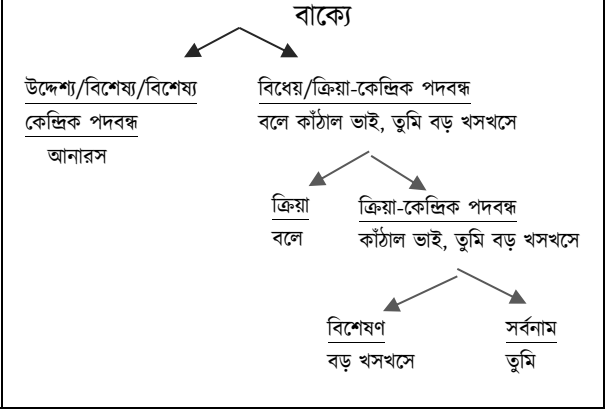

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলার রূপান্তরমূলক সৃজনশীল ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন পবিত্র সরকার। পশ্চিম বাংলায় চমস্কি তত্ত্বের প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে (সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষাবিচারে তার প্রয়োগ)। তিনি Transformational অর্থে রূপান্তরমূলক নয়, সংবর্তনী এবং Generative অর্থে সৃজনশীলের পরিবর্তে সঞ্জননী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। Transformational Generative Grammar বলতে বাংলাভাষায় 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ'কেই বোঝায়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে উদয়কুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা পদগুচ্ছের সংকলন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, যেটি সঞ্জননী ব্যাকরণতত্ত্বের একটি সুচিন্তিত মৌলিক গ্রন্থ। বাংলা ভাষার পদগুচ্ছের সংগঠনে তিনি ইংরেজি সংবর্তনী ব্যাকরণকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করেননি। প্রয়োজনবোধে বাংলা বাক্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদগুচ্ছকে নতুন বিন্যাস দিয়েছেন।

বর্তমানে অনেকে ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রকে 'ব্যাকরণ' নামে অভিহিত করে থাকেন। কেননা উভয়ের আলোচনা বর্ণনামূলক। প্রাচীনকালে মনে করা হত ভাষা কেমন হবে, কোন্ নিয়মে চলবে - তা বলে দেবে বা নির্দেশ দেবে ব্যাকরণ (নির্দেশমূলক ব্যাকরণ)। বিশ শতক থেকে ভাষা চর্চায় দেখা গেছে নতুন ঝোঁক। ভাষাবিজ্ঞানীরা জোর দিয়েছেন মুখের ভাষার উপর, যাকে বলা হয় বর্ণনামূলক ব্যাকরণ।

ভাষা সৃষ্টির অনেক পরে এসেছে 'ব্যাকরণ'। 'ব্যাকরণ' (বি-আ-কৃ+ল্যুট্) শব্দের আক্ষরিক অর্থ বিশেষ ও সম্যক রূপে বিশ্লেষণ করা। যে শাস্ত্র ভাষাকে সম্যক বিশ্লেষণ করে তার গঠনরীতি ও স্বরূপকে চিনিয়ে দেয় এবং শুদ্ধ করে বলতে ও লিখতে শেখায়, তাকে বলে ব্যাকরণ। প্রতিটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষার মতো বাংলা ভাষারও ব্যাকরণ আছে। বাংলা ব্যাকরণের বয়স কাল আড়াইশো বছর। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স প্রায় এক হাজার একশ বছরের বেশি। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগীজ পাদরি আস্‌সুম্প সাঁও এবং ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হালহেড এই দু'জন বিদেশি বাংলা ব্যাকরণ (Vocabulario em idioma Bengalla em Portuguez dividio em duas Partes, A Grammar of the Bengal Language) রচনা করেন ইংরেজিতে।[৩] এছাড়া কেরি-হটন-ইয়েটস-ওয়েঙ্গার প্রমুখ সাহেবরা ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেন। তবে বইটি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে লেখা হয়ে (Bengalee Grammar in the English Language) প্রকাশিত হয়েছিল। মোটামুটি ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ লেখার জোয়ার আসে। বিংশ শতাব্দীতে এসে বহু ভাষাতত্ত্ববিদ ও বৈয়াকরণিক বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রখ্যাত দু'জন ভাষাতত্ত্ববিদ ও বৈয়াকরণিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লণ্ডন ও প্যারিসে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করে স্বদেশে ফিরে আসেন। তারপর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, পবিত্র সরকার, জ্যোতিভূষণ চাকী প্রমুখ ব্যক্তিত্বেরা ব্যাকরণ রচনা করেন। ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় হলো পাঁচটি–

(১) ধ্বনিতত্ত্ব (ধ্বনি ও বর্ণের সম্পর্ক, ধ্বনি পরিচয়, ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন রীতি, সন্ধি প্রভৃতি)
(২) রূপতত্ত্ব [প্রত্যয়, পদপরিচয় (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়), পদান্তর, কারক, সমাস]
(৩) বাক্যতত্ত্ব
(৪) শব্দ ভাণ্ডার (শব্দার্থের জাতিগত শ্রেণিকরণ, বাগ্‌ধারা) ও
(৫) শব্দার্থতত্ত্ব (শব্দের সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ, প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের
ভিন্নার্থ, শব্দার্থের পরিবর্তন)।

এই পাঁচটি পর্বের মধ্যে ব্যাকরণের সমস্ত বিষয়ই আলোচিত।

নান্দনিক অনুভূতি ও ব্যবহারিক প্রয়োজন এ দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে খুব সমৃদ্ধ উপাদান হল প্রবাদ। এর দেহাবয়ব ছোট অথচ অর্থের দিক থেকে অসামান্য। সরল ও সংক্ষিপ্ত অথচ রসময় ব্যঞ্জনার জন্য লোকসমাজে প্রবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় সম্পদ। ছড়ার তুলনায় একটু হালকা, অসংলগ্ন হলেও এর ঘনবুনেটের নিটোল ভাষার বাক্যবিন্যাস আমাদের বুদ্ধি ও মনকে আকর্ষণ করে এবং সমাজ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও পরিবেশকে সচেতন করে। এমন কোনো লোক পাওয়া যাবে না, যিনি অন্তত দু'চারটি প্রবাদ বাক্য জানেন না বা সময় বিশেষে কথাবার্তায় তা প্রয়োগ করেন না। অর্থাৎ দেশের লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর থেকে স্বাক্ষর লোক প্রবাদের ব্যবহার করেন। প্রবাদের অর্থ কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। যে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে বেশ কয়েকটি বাক্যের প্রয়োজন হয় তা কখনো বাক্যাংশ বা একটি খণ্ডিত বাক্য ব্যবহারে শ্রোতার বোধগম্য হয়ে ওঠে সহজে। প্রবাদের শক্তি এখানেই। সাধারণের রচনার সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য এই যে, সাধারণ লেখা ব্যক্তি বিশেষের রচনা, কিন্তু প্রবাদ অনেক সময়ই স্রষ্টা নিরূপিত হন না। লোকসমাজের সৃষ্টি প্রবাদ। জাতীয় জীবনে তা প্রবাহিত হয়ে চলে স্বাভাবিকভাবে। তবে একথা ঠিক প্রতিটি প্রবাদ প্রথম রচয়িতার জীবন অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। একজনের সহজ বুদ্ধিতে যা প্রতিফলিত তাই জনসমাজে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয় যুগ যুগ ধরে। প্রবাদ এভাবেই একযুগ থেকে আর একযুগে, এক সংস্কৃতি থেকে আর এক সংস্কৃতি ভাবনার বাহন হয়ে ওঠে। প্রবাদ সম্পর্কে ইউরোপের স্পেনদেশীয় একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'A Proverb is a short sentence based on long experience।'[৪] পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রবাদের ছ'টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন - সংক্ষিপ্ততা, সরলতা, সাধারণ গুণ, অলঙ্কার, প্রাচীনতা এবং সত্যতা। তবে এই ছ'টি গুণের মধ্যে প্রবাদ আটকে নেই। এ পর্যন্ত বাংলা প্রবাদের নির্ভরযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে বাংলা প্রবাদের সাহিত্যিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এমনকি অর্থনৈতিক দিক, কিন্তু বাংলা প্রবাদের ভাষাতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণগত দিক নিয়ে বিস্তারিত তেমন আলোচনা হয়নি। বাংলা প্রবাদে ব্যকরণের বিষয়গুলি কীভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে তা দেখা যাক।

i) **ধ্বনি পরিবর্তন** - মনের ভাব আদান-প্রদানের প্রয়োজনে ভাষার সৃষ্টি। ভাষা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বহু বিচিত্রভাবে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এবিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চারটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন- ধ্বনির লোপ, ধ্বনির আগম, ধ্বনির রূপান্তর, ধ্বনির স্থানান্তর। বাংলা প্রবাদে ধ্বনি পরিবর্তনের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

ক) ইষ্টিসেন, কেশব সেন, উইল্ সেন।/ তিন সেনেতে জাত মারলেন।। (আদিস্বরাগম/ ষ্টেসন>ইষ্টিসেন)

খ) রতনে রতন চেনে। (মধ্যস্বরাগম/ রত্ন>রতন)

গ) পিণ্ডি পায় না কেত্তন চায়। (অন্ত্যস্বরাগম/ পিণ্ড>পিণ্ডি)

ঘ) আড়ালে বসে ভাত খায়, তবু বেটীর রোজা থায়। (আদিব্যঞ্জনাগম/ ওঝা>রোজা)

ঙ) ঝোলের লাউ অম্বলের কদু। (মধ্যব্যঞ্জনাগম/ অম্ল>অম্বল)

চ) নাটা মানুষ আগে মাতে, নাটা জমিন আগে ফাটে। (অন্ত্যব্যঞ্জনাগম/ জমি>জমিন)

ছ) আমি কি নাচন জানিনা/জাইন্যা নাচন করি না। (অপিনিহিতি/ জানিয়া>জাইন্যা)

জ) মিথ্যে কাজে সত্যি মুখপাত। (প্রগত স্বরসঙ্গতি/ মিথ্যা>মিথ্যে)

ঝ) আজ বেণে, কাল পোদ্দার। (পরাগত সমীভবন/ পোতদার>পোদ্দার)

ঞ) বামুন বাকস বাঁশ, তিনে বাস্তু নাশ। (ধ্বনির স্থানান্তর বা বিপর্যাস/ বাসক>বাকস)

ii) **সন্ধি** - বাংলা ভাষার প্রকৃতি অবশ্য সন্ধি প্রবণ নয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সন্ধি-প্রবণতা খুব বেশি। সংস্কৃত ভাষার অসংখ্য সমাসবদ্ধ সন্ধিযুক্ত পদ অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ায় বাংলা ভাষায় সন্ধি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বাংলা ভাষায় নিজস্ব দু'একটি সন্ধি রয়েছে। দ্রুত উচ্চারণে পাশাপাশি অবস্থিত সন্নিহিত দু'টি পদের প্রথমপদের শেষবর্ণ ও পরপদের প্রথম বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। এর ফলে কখন দু'টি বর্ণ একটি বর্ণে পরিণত হয়, কখনও বা দু'টি বর্ণের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। সন্ধি তিন প্রকার – (অ) স্বরসন্ধি, (আ) ব্যঞ্জনসন্ধি, (ই) বিসর্গসন্ধি। বাংলা প্রবাদে বেশ কছু সন্ধিবদ্ধ পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ক) আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট। (স্বরসন্ধি/ যথেষ্ট = যথা+ইষ্ট)

খ) অভাগা যদ্যপি চায়।/ সাগর শুকাইয়া যায়। (স্বরসন্ধি/ যদ্যপি = যদি+অপি)

গ) থাকতে ঘর সন্ন্যাস, তার উপরে উপবাস। (ব্যঞ্জনসন্ধি/ সন্ন্যাস = সম+ন্যাস)

ঘ) কুসংবাদ বাতাসের আগে ধায়। (ব্যঞ্জনসন্ধি/ সংবাদ = সম্+বাদ)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঙ) বেতালে আর মাতালে, সিংহ আর শৃগালে। (নিপাতনে-সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি/ সিংহ = হিন্‌স্+অ)
চ) বিধির মনে যা, নিশ্চয় ঘটবে তা। (বিসর্গসন্ধি/ নিশ্চয় = নিঃ+চয়)
ছ) নিষ্ফলা গাছে বানরও চড়ে না। (বিসর্গসন্ধি/ নিষ্ফলা = নিঃ + ফলা)

iii) **শব্দার্থ পরিবর্তন** - ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থ তত্ত্ব বলে। কোনো কোনো বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার শুধু বাইরের গঠনের উপর জোর দেন এবং শব্দার্থকে ভাষা বিজ্ঞানের বর্হিভূত বলে মনে করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি যে রূপান্তরমূলক সৃজনশীল ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন, সেখানে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি ভেতরের অর্থের পরিবর্তন হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারাগুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন - অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, অর্থসংক্রম। এছাড়া শব্দার্থের উন্নতি (উৎকর্ষ) এবং অবনতি (অপকর্ষ) নামে আরও দু'টি ধারার কথা বলেছেন। বাংলা প্রবাদে শব্দার্থ পরিবর্তনের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রবাদ	শব্দ	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ	শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা
আমিও মাঝি হলেম, গাঙও বাঁকা হল।	গাঙ	গঙ্গা নদী	যে কোনো নদী	অর্থের বিস্তার
বাড়ির গরু মাঠের ঘাস খায় না।	ঘাস	খাদ্য	তৃণ	অর্থের সংকোচ
কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ।	সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন বিশেষ	অর্থের রূপান্তর
পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর মন্দির দেখা।	মন্দির	গৃহ	দেবালয়	অর্থের উন্নতি
উপোসের নাগর, পারণের ঠাকুর।	নাগর	নগর বাসী	অবৈধ প্রণয়ী	অর্থের অপকর্ষ

iv) **প্রত্যয়** - ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগের দু'টি ভাগ রয়েছে – (অ) প্রত্যয় নিষ্পন্ন ও (আ) অনুষঙ্গ নিষ্পন্ন।

(অ) প্রত্যয় নিষ্পন্ন - শব্দ বা ধাতুর পরে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করলে নতুন শব্দ বা ধাতুর সৃষ্টি হয়, তাকে প্রত্যয় বলে। অর্থাৎ প্রত্যয় হল নতুন নতুন শব্দ বা ধাতু তৈরির পদ্ধতি। প্রত্যয় দু'প্রকার - ধাতু-প্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয় ও শব্দ প্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয়। ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে কৃৎপ্রত্যয় এবং কৃৎপ্রত্যয় যোগে যে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে কৃদান্ত শব্দ। আর শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। বাংলা প্রবাদে কৃৎপ্রত্যয় বা কৃদান্ত শব্দ ও অদ্ধিত প্রত্যয় বা তদ্ধিতান্ত শব্দের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

ক) ক্ষিদের নেই চাট্‌নি, ঘুমের নেই শয্যা। (সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়/ শয্যা=শী+ক্যপ্)
খ) কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি। (বাংলা কৃৎপ্রত্যয়/ হাসি= হাস্+ই)
গ) পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস। (সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়/ পাণ্ডব=পণ্ডু+ষ্ণ)
ঘ) কামার গড়বে যা, মনে মনে জানে তা। (বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়/ কামার= কাম+আর)
ঙ) সুদখোর আর মদখোর সমান। (বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়/ সুদখোর = সুদ+খোর, মদখোর= মদ+খোর)

(আ) অনুষঙ্গ নিষ্পন্ন - অনুষঙ্গ নিষ্পন্ন শব্দগুলি হল – ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, অনুকার শব্দ। বাংলা প্রবাদ বাক্যে অনুসঙ্গ নিষ্পন্ন শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ - ক) অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।
খ) অমাবস্যার পিদ্দিম টিপ্‌টিপ্ করে।
গ) ভাত উথলালে দিক কাঠি, জ্বাল দিবে গুটিগুটি।/ তবে ভাতের পরিপাটি।

শব্দদ্বৈত - ক) একসাথে এলাম পাঁচভাই/ শেষে দেখি ঠাঁইঠাঁই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খ) আটে পিঠে নোয়া।/ নিত্য নিত্য থোয়া।

অনুকার শব্দ - ক) এক বিয়ের মাগ নড়ে চড়ে/ দোজ বরের মাগ পুড়িয়ে মারে।

খ) বোন সতীনে নাড়ে চাড়ে/ বোন সতীনকে পুড়িয়ে মারে।

গ) মামার জয়েই জয়।

ঘ) মাসামাসি গেছে, সাঁঝাসাঁঝি আছে।

vi) সমাস - সংক্ষেপে সুন্দর করে বলার উদ্দেশ্যে পরস্পর অর্থ-সম্পর্কিত দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণতকে সমাস বলে। সমাসে একাধিক পদ মিলে একটি নতুন পদ তৈরি হলে তাকে সমস্ত-পদ বা সমাস-বদ্ধ পদ বলে। সংস্কৃতে সমাস চার প্রকার (দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, অব্যয় ও বহুব্রীহি) কিন্তু বাংলায় সমাস ছয় প্রকার - দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, অব্যয় ও বুব্রীহি। বাংলা প্রবাদে বহু সমাসবদ্ধ শব্দ লক্ষ্য করা যায়।

ক) দুধে-ভাতে থাকা। (মিলনার্থক দ্বন্দ্ব/ দুধে-ভাতে = দুধে ও ভাতে)

খ) কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। (মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি/ কুম্ভকর্ণ = কুম্ভের ন্যায় কর্ণ যার)

গ) রথ দেখা কলা বেচা। (কর্ম তৎপুরুষ/ রথ দেখা = রথকে দেখা)

ঘ) বক-ধার্মিক। (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়/ বক-ধার্মিক = বকের ন্যায় ধার্মিক)

ঙ) ঠুকরে-ঠাকরে আনবে, তেমাথায় হাঁড়ি জ্বালাবে। (দ্বিগু সমাস/তেমাথা = তিন মাথার সমাহার)

চ) অর্থই অনর্থ। (অব্যয়ীভাব/ অনর্থ = অর্থের অভাব)

vii) শব্দ ভাণ্ডার - ভাষার প্রাণ শব্দ। এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ যখন কোনো অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে শব্দ বলে। ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধির মূলে আছে তিনটি সূত্র - (১) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দ, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ, (২) অন্য ভাষা থেকে ঋণ হিসেবে গৃহীত শব্দ, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে আগন্তুক শব্দ বা কৃতঋণ শব্দ, এবং (৩) নতুন শব্দ সৃষ্টি, যার নাম দেওয়া হয়েছে নব সৃষ্ট শব্দ। বাংলা প্রবাদে শব্দ ভাণ্ডারের বহু শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ক) আঁধারে আনে, জ্যোৎস্নায় যায়/ তাঁর নরক হাতে হাতে পায়। (তৎসম/ জ্যোৎস্না)

খ) অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি। (তদ্ভব/ ঝি)

গ) এক পো চালের পরমান্ন, গা শুদ্ধ নেমন্তন্ন। (অর্ধতৎসম/ নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন)

ঘ) ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়ানো। (দেশি_অষ্ট্রিক/ ঝাঁটা)

ঙ) আকালে কি না খায়, বিবাদে কি না যায়। (দেশি_দ্রাবিড়/ আকাল)

চ) থাকতে কাঁচি হারাল দাও। (বিদেশি_তুর্কী/ কাঁচি)

ছ) আনারস বলে কাঁঠালভাই, তোর গা বড় খসখসে।(বিদেশি_পর্তুগীজ/আনারস)

জ) শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।(বিদেশি_ইংরেজি/শমন)

viii) উপসর্গ - 'উপ' কথাটির অর্থ হল আগে। ধাতুর আগে বসে উপসর্গ নতুন শব্দ গঠন করে। অর্থাৎ যে অব্যয় ধাতুর আগে বসে ধাতুর অর্থকে পরিবর্তিত করে বা ধাতুর অর্থকে বিশিষ্টতা দেয় তাকে উপসর্গ বলে। বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার – (১) সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ, (২) দেশি বা বাংলা উপসর্গ, এবং (৩) বিদেশি উপসর্গ। বাংলা প্রবাদে উপসর্গ যোগে নতুন শব্দের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

(১) সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ :

ক) পরা (পরামর্শ) - যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার পরামর্শে।

খ) অপ (অপমান) - অপমানের পরাণ, সম্মানকে ডরান।

গ) অনু (অনুরাগ) - অনুরাগ বিনে গৌর আস্‌বে কেনে।

ঘ) বি (বিচ্ছেদ) - জন্ম হয়নি মৃত্যু হল, পিরীত নেই তার বিচ্ছেদ এল।

ঙ) সু (সুসময়) - সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।/ অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চ) অভি (অভিলাষ) - যাহা রয় বারো মাস, এমন কর অভিলাষ।

ছ) অতি (অতিদর্প) - অতিদর্পে হতা লঙ্কা।

(২) দেশি বা বাংলা উপসর্গ : খাঁটি বাংলায় সংস্কৃতের মত উপসর্গ নেই। বাংলা উপসর্গ শব্দের আগে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। বাংলা উপসর্গগুলি বাংলার নিজস্ব।

ক) আ (আগাছা) - আগাছার বড় বাড়।

খ) নি (নিধিরাম) - ঢাল না তলবার, নিধিরাম সর্দার।

গ) নির (নির্বুদ্ধি) - কে বলে ডাক নির্বুদ্ধি/ মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি।

ঘ) রাম (রামনাম) - আগে রামনাম, পাছে সবকাম।

ঙ) ভরা (ভরা-ডুবি) - শুকনো ডাঙায় ভরা-ডুবি।

(৩) বিদেশী উপসর্গ : বিদেশি উপসর্গ বাংলা উপসর্গের মতোই ধাতুর পূর্বে না বসে বিশেষ্য বা বিশেষণের পূর্বে বসে। এগুলির উৎস প্রায়ই আরবি-ফারসি অথবা ইংরেজি।

ক) গর (গরজায়) - গরজায় কিন্তু বর্ষায় না।

খ) সব (সবকাম) - আগে রামনাম, পাছে সবকাম।

গ) ফুল (ফুলশয্যা) - মাগ নেই তার ফুলশয্যা।

ix) অনুসর্গ - যে সব পদ বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির ভেতর সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য পদের 'অনু'তে বা পরে বসে এবং শব্দগুলি বিযুক্ত হলেও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অর্থযুক্ত থাকে, তাদের অনুসর্গ বলে। বাংলা অনুসর্গগুলি দু'টি প্রধান শ্রেণিতি বিভক্ত - (১) নাম অনুসর্গ, (২) ক্রিয়া অনুসর্গ। নাম অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হয় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ। এগুলি শব্দজাত। অন্যদিকে ক্রিয়া অনুসর্গ হল ক্রিয়াজাত। বাংলা প্রবাদে অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(১) নাম অনুসর্গ (তৎসম, তদ্ভব, বিদেশী) :

ক) অপেক্ষা (তৎসম) – উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভালো।

খ) জন্য (তৎসম) – ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

গ) বিনা (তৎসম) – কাঁটা বিনা কমল নাই, কলঙ্ক বিনা চাঁদ নাই।

ঘ) ছাড়া (তদ্ভব) – কানু ছাড়া গীত নাই।

ঙ) তরে (তদ্ভব) – অন্নপূর্ণ যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।

চ) পানে (তদ্ভব) – নিজের পানে চায় না ছুড়ি, পরকে বলে টোপাগালী।

ছ) বদলে (পরিবর্তে) – নাকের বদলে নরুণ। (বিদেশী)

জ) বাদে (পশ্চাৎ) – আজ বাদে কাল। আগে খেশ, বাদে দরবেশ। (বিদেশী)

ঝ) হুজুর (সম্মুখে, সমীপে) – মজুরকে লাথি হুজুরকে সেলাম। (বিদেশী)

(২) ক্রিয়া অনুসর্গ :

ক) করিয়া (করণ) – তামা তুলসী হাতে করিয়া বলা।

খ) করে (অধিকরণ) – দধি দুগ্ধ করে ভোগ, ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ।

গ) চাইতে, চেয়ে (তারতম্য বোঝাতে) – আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।

ঘ) থেকে (অপাদান) – আকাশ থেকে পড়া।

ঙ) বলিয়া, বলে (নিমিত্তার্থে) – উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।

x) শব্দ - নামপদের বিভক্তিহীন মূল অংশ শব্দ নামে পরিচিত। এক বা একাধিক বর্ণ বা অক্ষর পাশাপাশি বসে যদি একটি অর্থ বোঝায়, তাকে শব্দ বলে। গঠন রীতির দিক থেকে শব্দ দু'প্রকার - (অ) মৌলিক শব্দ ও (আ) সাধিত শব্দ।

অ) মৌলিক শব্দ - যেসমস্ত শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। বাংলা প্রবাদে মৌলিক শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক) ঢাকের মতন নাকের গড়ন। (নাক)
খ) কাকে নিয়ে গেল কান, কাকের পিছে ধাবমান। (কান)
গ) যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার পরামর্শে। (পরামর্শ)
ঘ) কাগজ, কলম, কালি, এই তিন নিয়ে বালী। (কাগজ)

আ) সাধিত শব্দ - সমাসের দ্বারা গঠিত অথবা ধাতু বা শব্দের উত্তর প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দকে সাধিত শব্দ বলে। সাধিত শব্দ মাত্রেই বিশেষণযোগ্য। অর্থ বা ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সাধিত শব্দ তিন প্রকার – (ক) যৌগিক শব্দ, (খ) রূঢ় শব্দ, (গ) যোগরূঢ় শব্দ। বাংলা প্রবাদে সাধিত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ক) যৌগিক শব্দ- ঠাকুরের ঠাকুরালি, মজুরের মজুরালি। [ঠাকুরালি (ঠাকুরের ভাব) = ঠাকুর (দেবতা অর্থে) + অলি (ভাব অর্থে)]
খ) রূঢ় শব্দ- কাগজ না পত্র, কুশল সর্ব্বত্র।
গ) যোগরূঢ় শব্দ- অন্ন বিনা ছন্নছাড়া। ['অন্ন' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ 'খাদ্য'। কিন্তু শব্দটি বাঙালির প্রধান খাদ্য 'ভাত' অর্থে প্রযুক্ত।]

xi) সমার্থক শব্দ (প্রতিশব্দ বা সমনাম শব্দ) - এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাদের উচ্চারণ এবং বানান সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু অর্থ এক। এরূপ শব্দসমূহকে পরস্পরের প্রতিশব্দ বলে। আবার এদের সমনাম বা সমার্থক শব্দও বলে। বাংলা প্রবাদে সমার্থক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

সূর্য - ক) রবি - কত রবি জ্বলে রে, কেবা আঁখি মেলে রে।
খ) তপন - তেল, তামাক, তপন, তুলা, তপ্ত ঘি।/ পাছুড়ি, খিচুড়ি, আর শ্বাশুড়ির ঝি।।
গ) ভানু - জানু, ভানু, কৃশানু, শীতের পরিত্রাণ।

xii) বিশেষণ – যে পদ বিশেষ্য বা অন্য পদের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থান, পরিমাণ ইত্যাদিকে প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ বলে। সাধারণত এটি যাকে বিশেষিত করে, তার আগে বসে। বিশেষিত পদের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষণ কয়েক প্রকার। বাংলা প্রবাদ বাক্যে বিশেষণবাচক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

অ) সংখ্যাবাচক বিশেষণ শব্দ- ক) চোরের দশ দিন, সাধুর এক দিন। (দশ, এক)
খ) চেটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন। (লাখ)
গ) চাষার কেবল এগার মাস দুঃখ, আর সকল মাস সুখ। (এগার)

আ) পূরণবাচক বা ক্রমবাচক শব্দ- ক) প্রথম বয়সে না হলে পুত, মায়ের সুখ না বাপের সুখ। (প্রথম)
খ) বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তিরক্ষে। (তৃতীয়)

xiii) সর্বনাম - বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। ব্যবহারের দিক থেকে সর্বনামপদ আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে থাকে - (১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম, (২) নির্দেশক বা উল্লেখসূচক সর্বনাম, (৩) সাকল্যবাচক বা সমষ্টিবাচক সর্বনাম, (৪) সম্বন্ধ, সংযোগ বা সঙ্গতিবাচক সর্বনাম, (৫) প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাসূচক, (৬) অনিশ্চয়সূচক বা অনির্দেশক সর্বনাম, (৭) আত্মবাচক সর্বনাম, (৮) ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম। বাংলা প্রবাদে সর্বনাম পদের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ক) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক - আমার নাম নিতাই।/ এক খাই এক থি-তাই। (উত্তম পুরুষ_আমরা)
খ) নির্দেশক বা উল্লেখসূচক সর্বনাম - একে রামানন্দ, তার ধূনার গন্ধ। (নৈকট্যসূচক_একে)
গ) সাকল্যবাচক বা সমষ্টিবাচক সর্বনাম - সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা। (সব)
ঘ) সম্বন্ধ, সংযোগ বা সঙ্গতিবাচক সর্বনাম - রাজার যে রাজ্যপাট, ক'দিন সে রয় ঠাট। (যে-সে)
ঙ) প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাসূচক - অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল। (কে)
চ) অনিশ্চয়সূচক বা অনির্দেশক সর্বনাম - আপন ঘোল কেউ টক বলে না। (কেউ)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছ) আত্মবাচক সর্বনাম – আলচাল, বাসকের গুঁড়ি, আপন গরবে ফাঁপা টুরি। (আপন)

জ) ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম – কে কারে ধরে, আপনা-আপনি মরে। (আপনা-আপনি)

xiv) অব্যয় - যার কোন ব্যয় নেই, তাকে বলে অব্যয়। সোজা কথায় এই পদটি বিকারহীন। লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি ভেদে সকল পদের পরিবর্তন হয় কিন্তু অব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। অব্যয় যদিও নিজের চেহারাটিকে একটুও বদলাতে দেয় না, কিন্তু বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে এটি বক্তার বক্তব্যকে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে তোলে। দশটি শব্দ ব্যবহার করেও যে ভাব প্রকাশ করা কঠিন হয়ে ওঠে, একটি অব্যয়ের ব্যবহারে সেটি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। বাংলা প্রবাদ বাক্যে অব্যয়ের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১) পদান্বয়ী অব্যয় - বাক্যের অন্তর্গত বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে যে অব্যয়ের অন্বয় হয়, সেই অব্যয়কে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন - বিনা, সহিত, সঙ্গে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, হইতে, থেকে, জন্য, নিমিত্ত, উপর প্রভৃতি।

ক) ভক্তি বিনা মুক্তি নেই। (বিনা)

খ) এক শয্যার সাথী, সঙ্গে কাটাই রাতি। (সঙ্গে)

গ) পান থেকে চুন খসে না, এমনি হল গিন্নিপনা। (থেকে)

২) সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় - যে অব্যয়ের সাহায্যে একাধিক বাক্য, বাক্যাংশ বা পদ সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়, সেই অব্যয়কে বলে সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয়। আবার একে কেউ কেউ সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলে। এটি আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত - সংযোজক, বিযোজক, সংকোচক, সাপেক্ষ, ব্যবস্থাত্মক, কারণাত্মক, ব্যতিরেকাত্মক, সিদ্ধান্তবাচক, সমাপ্তিবাচক, সংশয়বাচক, প্রশ্নসূচক, নিত্যসম্বন্ধীয়, ক্রিয়া-বিশেষণবাচক, বাক্যালঙ্কার, উপমাদ্যোতক।

ক) সংযোজক - চিত্ত সুখে গীত, আর পেটের সুখে নীদ। (আর)

খ) বিযোজক - মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। (কিংবা)

গ) সংকোচক - কৃপণের ধন দ্বিগুণ ব্যয়, তবু কৃপণ সুজন নয়। (তবু)

ঘ) সাপেক্ষ - খেতে যদি হয় সাধ, সকলই পরসাদ। (যদি)

ঙ) কারণাত্মক - কার্য্যে সাক্ষী কারণ, পুণ্যের সাক্ষী মরণ। (কারণ)

চ) সংশয়বাচক - না চাইলে ঘোড়াটা পাই, চাইলে বুঝি হাতিটা পাই। (বুঝি)

ছ) প্রশ্নসূচক - আকাশে গুড়গুড়ি পাখী, উড়লেই চিল হয় নাকি। (নাকি)

জ) নিত্যসম্বন্ধীয় - যাহা বাহান্ন, তাহা তিপান্ন। (যাহা-তাহা)

৩) অনন্বয়ী অব্যয় - বাক্য ও পদের সঙ্গে সব অব্যয়ের অন্বয় হয় না। অন্বয় বা সম্বন্ধ যাদের হয় না, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। বাক্যে ব্যবহৃত হয়েও যে অব্যয়গুলি বাক্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত নয়, সেই অব্যয়কে বলে অনন্বয়ী অব্যয়।

ক) খাটো কাপড় বেড়ে আঁটে না। (বেড়ে)

খ) গোঁফের বাহার বলিহারি, চেপটা নাকে চটক ভারি। (বলিহারি)

গ) শুনে গেলাম বউ দেখতে, বউ চায় আমায় ধরে খেতে। (গেলাম)

ঙ) যেখানে নেই আসল মায়া, সেখানে বেশি আহা। (আহা)

৪) অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় - ধ্বনি বা ভাবের অনুকরণে যে অব্যয় সৃষ্টি হয় সেই অব্যয়গুলিকে বৈয়াকরণেরা নাম দিয়েছেন অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

ক) আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলায় ঠন্ ঠন্। (ঠন্ ঠন্)

খ) জিভ লক্ লক্ করা। (লক্ লক্)

গ) হাতে নেই কড়া বট, প্রাণ করে ছটফট। (ছটফট)

ঘ) যেই পাখী উড়ে, বাসায়াই দরদর করে। (দরদর)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

xv) ক্রিয়া - যে পদের দ্বারা কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। অন্যদিকে ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে পদ গঠিত হয়, তাকেও ক্রিয়াপদ বলে। ভাব প্রকাশের ধরন বা অবস্থা অনুযায়ী ক্রিয়া দু'প্রকার – (অ) সমাপিকা ক্রিয়া, (আ) অসমাপিকা ক্রিয়া।

(অ) সমাপিকা ক্রিয়া - যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ বা ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে বলে সমাপিকা ক্রিয়া। কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়ার নিজস্ব কোনো অর্থ থাকে না। প্রবাদ বাক্যে এই ধরনের ক্রিয়ার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

ক) আগুন নিয়ে খেলা। (খেলা)

খ) ফাটকা কলে আটকে পড়া। (পড়া)

গ) খেলাম বা না খেলাম, মালসা ত একটা ভাঙলাম। (ভাঙলাম)

(আ) অসমাপিকা ক্রিয়া - যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণতার জন্য একটি সমাপিকা ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। বাংলা প্রবাদ বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়।

ক) (-ইলে) পড়লে চাষা গরু খায়, উঠলে চাষা বামুন খায়।

খ) (-এ) শাশুড়ি মল সকালে/ খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত/ কাঁদব আমি বিকালে।

গ) (-আ) দশের নড়ি একের বোঝা।

(ই) যৌগিক ক্রিয়া – 'ইয়া' বা – 'ইতে' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে উভয়ে মিলে একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করলে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ যৌগিক ধাতুর পরে ধাতু বিভক্তি যুক্ত হলেই যৌগিক ক্রিয়া পাওয়া যায়। প্রবাদ বাক্যে এই ধরনের ক্রিয়ার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

ক) গরবে বেটি আমার বুক ফুলিয়ে হাঁটে। (অসমাপিকা - ফুলিয়ে, সমাপিকা - হাঁটে)

খ) সহজে রাধা কলঙ্কিনী বুক চিতিয়ে হঁটে। (অসমাপিকা - চিতিয়ে, সমাপিকা - হাঁটে)

xvi) বিপরীতার্থক শব্দ - যে শব্দ অন্য কোনো শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে পরস্পরের বিপরীতার্থক শব্দ বলে। বাংলা প্রবাদে বিপরীতার্থক শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

ক) অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। (রাত্রি – দিন)

খ) আগে সঞ্চয় পরে ব্যয়। (সঞ্চয় – ব্যয়)

গ) অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়। (অভ্যাস – অনভ্যাস)

xvii) বাগ্‌ধারা বা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ/শব্দসমষ্টি বা ইডিয়াম - বাগ্‌ধারা বা বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টি বা ইডিয়াম এবং প্রবাদ এক নয়। প্রবাদ হল একটি সম্পূর্ণ বাক্য, যেখানে একটি ভাব বা বক্তব্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। বাংলায় ইডিয়ামকে বলা হয় বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ, যা নাকি প্রবাদের অংশ মাত্র। এমন বেশ কিছু প্রবাদ পাওয়া যায়, যেখানে বিশেষ অর্থযুক্ত এইসব ইডিয়াম বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে।

ক) কই মাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান। (কই মাছের প্রাণ)

খ) কলুর ছেলে গায় ভাল ঘানি গাছে শুয়ে।/কলুর বলদ ঘানি টানে চোখে ঠুলি দিয়ে।(কলুর বলদ)

গ) এটা ধরি না ওটা ধরি, হাতের পাঁচ ছাড়তে নারি। (হাতের পাঁচ)

ঘ) এখানে নয়, ওখানে ছয়। (নয় ছয়)

xviii) বাক্যবিন্যাসগত -

অ) পুনরাবৃত্তি - বাংলা প্রবাদের জগতে এমন কিছু প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে প্রবাদের দু'টি অংশ একে অন্যের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

ক) পর নয় আপন, আপন নয় পর।

খ) থোড়া বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গ) রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।

আ) নেতিবাচক বা নেতিকরণ - যে বাক্যে কোন ভাবের অস্তিত্ব বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। বাংলা প্রবাদের গঠন শৈলীতে নেতিবাচক বা নেতিকরণের একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

ক) এক পুত পুত নয়, এক চোখ চোখ নয়/ এক কড়ি কড়ি নয়।

খ) সাঁঝের অতিথি অতিথি নয়/ বিহানের বাদল বাদল নয়।

গ) অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই।

ই) প্রশ্নবোধক - গঠন শৈলীর বিচারে বেশ কিছু বাংলা প্রবাদে প্রশ্নবোধক প্রবাদ দেখা যায়।

ক) কানা কি বুঝে চাঁদের আলো?

খ) কাদা মেখে ধোয় কাদা, তারে কেবা বলে গাধা?

গ) কেঁচোয় যদি মাথা তুলে কেউ কি তারে কেউটে বলে?

ঈ) অনুজ্ঞাবাচক - গঠন শৈলীর বিচারে বেশ কিছু বাংলা প্রবাদে অনুজ্ঞাবাচক অর্থাৎ আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা বিষয়ক প্রবাদ দেখা যায়।

ক) কায়েত, কালসাপ, বেদোনারী তিনজনকে পরিহারি।

খ) কানে কালা হও চোখে কানা হও।

গ) কাঙালকে শাকের খেত দেখাতে নেই।

উ) নির্দেশাত্মক - গঠন শৈলীর বিচারে বেশ কিছু বাংলা প্রবাদে নির্দেশাত্মক প্রবাদ দেখা যায়।

ক) কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনও নয়। (অভিজ্ঞতা)

খ) কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে। (সতর্কীকরণ)

গ) কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশ বনের প্যারী। (মন্তব্য)

ঊ) বিস্ময়বোধক - গঠন শৈলীর বিচারে বেশ কিছু বাংলা প্রবাদে বিস্ময়াবধক অর্থাৎ বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ঘৃণা, ভর্তসনা, খেদ, করুণা, প্রশংসা বিষয়ক প্রবাদ দেখা যায়।

ক) এমন পদার্থ ছেড়ে মালা জপে কোন ভেড়ের ভেড়ে। (ভর্তসনা)

খ) এমন সুন্দরের মুখে ছাই, জাতি কুলের ঠিক নাই। (ভর্তসনা)

গ) কাজ নেই ত করি কি, গলায় একগাছ দড়ি দি। (খেদ)

xix) উপভাষা - উপভাষা কোনো একটি ভাষা সম্প্রদায়ের স্থানিক লক্ষণ-চিহ্নিত ভাষারূপ। ধ্বনিগত, রূপগত ও শব্দগত পার্থক্যের ফলে একটি উপভাষার সঙ্গে আর একটি উপভাষার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু ভৌগোলিক দূরত্বই নয়, কখনও অন্য ভাষা সম্প্রদায়ের প্রভাবও এই পার্থক্যের মূলে কাজ করে।

সাহিত্যে প্রবাদ ও উপভাষার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মূলত প্রবাদমূলক বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বাক্যগঠন পদ্ধতি ও উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"এ থেকে বোঝা যায়, প্রবাদগুলির উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল বা উপভাষা এলাকায় ...।"[৫]

অঞ্চলভেদে উপভাষার প্রভাবে কীভাবে উচ্চারণ ও শব্দ ব্যবহার প্রবাদে বারবার বদলে যাচ্ছে তার পরিচয় তুলে ধরা যাক।

ক) রাঢ়ী উপভাষা -

অবস্থান - মধ্য পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ কলকাতা, দুই ২৪-পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া প্রভৃতি।	
ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	**উদাহরণ (প্রবাদ)**
১) 'অ' স্থলে 'ও' উচ্চারিত হয়।	নুন খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার। (থাক>থাকো)
২) অভিশ্রুতি রাঢ়ী উপভাষায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।	কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস। (কালি>কাইল>কাল)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩) বিষম স্বরধ্বনি সম স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।	দিশি কুকুর মাহাট্টা গেল। (দেশি>দিশি)
৪) 'ল্' কোথাও কোথাও 'ন্'-রূপে উচ্চারিত হয়।	আমার এমনি গুণ, চূণকে বানাই নুন। (লবণ>নুন)

খ) বঙ্গালী উপভাষা -

অবস্থান- পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বাংলাদেশের ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি।	
ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	**উদাহরণ (প্রবাদ)**
১) অপিনিহিতির সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।	আমি কি নাচব জানি না?/ জাইন্যা নাচন করি না।
২) 'র' ও 'ড়'-এর বিপর্যাস লক্ষ্য করা যায়।	খায় দায় হারে চোষে/ বারে না কপালের দোষে। (হাড়ে>হারে, বাড়ে>বারে)
৩) 'ও'-কার 'উ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়।	আপনা আয়ু পরের ধন/ কম দেখে না কুন জন। (কোন>কুন)
৪) সংবৃত 'এ' > বিবৃত 'এ্যা' হয়।	দ্যাশে আইল মীরজাফর/ ঘর দুয়ার সামাল কর। (দেশ>দ্যাশ)
৫) 'শ' ও 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়।	হুটকীর নাওঅ বিলাই পরী। (শুটকী>হুটকী)
৬) অনেক সময় 'ল' > 'ন' হয়।	সাতপুরুষের নাউ খেলা। (লাউ>নাউ)

গ) বরেন্দ্রী উপভাষা -

অবস্থান - উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি।	
ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	**উদাহরণ (প্রবাদ)**
১) অনুনাসিক স্বরধ্বনি রাঢ়ীর মতো বরেন্দ্রীতে রক্ষিত আছে।	আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা।
২) 'র'-এর আগমন ও লোপ ঘটে।	শাঁসে জলে পাকা পুরুষ্ট হওয়া। (পুষ্ট>পুরুষ্ট) বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখতে পায়। (চন্দ্র>চাঁদ)
৩) সঘোষ মহাপ্রাণ সঘোষ অল্পপ্রাণ হয়।	যেমন তেমন গর, খান পাঁচ ছয় কর। (ঘর>গর)
৪) স্বরধ্বনি অপরিবর্তিত থাকে। তবে এ>এ্যা হয়।	চ্যারা তুলতে বোড়া উঠা। (চেরা>চ্যারা)

ঘ) কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা -

অবস্থান - উত্তর-পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পূর্ববঙ্গের রংপুর, কাছা শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি।	
ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	**উদাহরণ (প্রবাদ)**
১) 'অ' শ্বাসাঘাতের জন্য 'আ' উচ্চারিত হয়।	আতি আশ সর্বনাশ। (অতি>আতি)
২) ড়, ঢ় > র	আষার মাস, চাষার আশ। (আষাঢ়>আষার)
২) 'ন' ও 'ল'-এর বিপর্যয় ঘটে।	আন্‌লার কপাল, টেনাও সাজে। (আলনা>আনলা)
৩) 'ও' কখনো কখনো 'উ' হয়।	বিধাতা করেছে দোর বুলো বুলো। (বোলো>বুলো)
৪) স্বরধ্বনিতে অনুনাসিক দেখা যায়।	ভাত খেতে দাঁত পড়ে।

ঙ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষা -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবস্থান - দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ধলভূম, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি।	
ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	**উদাহরণ (প্রবাদ)**
১) অনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।	উটের পিঠে কুঁজ, উট জানে না। (সং. কুব্জ>কুঁজ)
২) 'ও'-কার 'অ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়।	বাঁদর সভাকর মদের ঘড়া, তিন নিয়ে গুপ্তি পাড়া। (ঘোড়া>ঘড়া)
৩) অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণে উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়।	ধূলা নেই তাঁর ঝাঁটা। (দূলা>ধূলা)
৪) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে পদমধ্যস্বর লোপ ও ব্যঞ্জন দ্বিত্ত হয়।	আগে সাম্‌লা ধাক্কা, পরে যাবি মক্কা। (ধাইকা>ধাক্কা, মইকা>মক্কা)
৫) নামধাতুর বহুল ব্যবহার দেখা যায়।	ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে করে আসা।(ঘটক+আলি= ঘটকালি)

মানব সভ্যতা যতদিন পৃথিবীর বুকে বিরাজ করবে, প্রবাদও ততদিন মানুষের মুখে উচ্চারিত হবে। এতদিন প্রবাদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, বিকাশ, প্রাচীন ইতিহাস, শ্রেণিবিভাগ ও সংগ্রহ প্রভৃতির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। এর বাইরে প্রবাদের ভাষা ও ব্যকরণ নিয়ে সামান্য দু'-একটি যা কিছু আলোচনা হয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। বাংলা প্রবাদের ভাষা ও ব্যাকরণের এত বিচিত্র দিক রয়েছে, যা সামান্য বিবরণে বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব। তবে আলোচনার নিরিখে প্রমান হিসেবে কিছু প্রবাদের ভাষা ও ব্যাকরণের দিকটি তুলে ধরে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে কোনো ধীমান গবেষক এই বিষয়ের গভীর অনুসন্ধানে ব্রতী হবেন, আই আশা রাখি।

Reference:

১. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার, রমেশ (সম্পাদনা) – প্রবন্ধ সঞ্চয়ণ (প্রবন্ধ- রামপ্রসাদ দে – বাংলা ভাষা-তত্ত্ব চর্চা), রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা- ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ - এপ্রিল, ২০০৯, পৃ. ১৩৩৯
২. ওই, পৃ. ১৩৪৪
৩. চৌধুরী, কালীপদ, বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা প্রসঙ্গ, বাণী সংসদ, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ – ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০০৫, পৃ. ১৫
৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা- ১২, প্রথম সংস্করণ - ১৯৫৪, তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৬২, পৃ. ৫৬৯
৫. সরকার, পবিত্র, বাংলা প্রবাদের রূপ, 'প্রমা' পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৬৩

Bibliography:

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার – লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস; পুস্তক বিপণি; ২৭, বেনিয়াটোলা লেন; কলকাতা- ৯; প্রথম সংকরণ- নভেম্বর, ১৯৭৭; তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ- জানুয়ারি, ১৯৯৯।
চক্রবর্তী, বরুণ কুমার(সম্পাদিত) – প্রবাদ প্রসঙ্গ; অক্ষর প্রকাশনী; ৩২, বিডন রো; কলকাতা- ৬; প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১০।
চক্রবর্তী, বরুণ কুমার – লোক সংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে; বুক ট্রাস্ট; ৩০/১বি কলেজ রো; কলকাতা- ৯; প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ১৯৯৯
চৌধুরি, দুলাল– প্রবাদ কোষ; দে'জ পাবলিশিং; ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট; কলকাতা- ৭৩; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১২।
দে, সুশীলকুমার (সম্পাদিত), বাংলা প্রবাদ, ছড়া ও চলিত কথা (২য় সংস্করণ), এ মুখার্জী, ১৩৫৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 524 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য (৬ষ্ঠ খণ্ড – প্রবাদ), ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা - ১২

সরকার, পবিত্র, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - এপ্রিল, ১৩৯১

শ', রমেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৯০

বিশ্বাস, ঊষাপতি, বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ইউনাইটেড বুক এজেন্সী, ২৯/১, কলেজ রো, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭

চক্রবর্তী, বামনদেব, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, অক্ষয় মালঞ্চ প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা, বি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭, প্রথম প্রকাশ - অক্টোবর ১৯৬৩, পরিবর্ধিত অষ্টাদশ সংস্করণ - নভেম্বর, ২০১৪

দাস, অমিতাভ, মাধ্যমিক বাংলা ভাষাপ্রকাশ, বেঙ্গল বুক সিণ্ডিকেট (প্রা) লিমিটেড, ১৭, বুদ্ধ ওস্তাগর লেন, কলকাতা- ৯; প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ২০০৪

Smith, W.G, Oxford Dictionary of English Proverbs, Clarendon Press, 2nd Ed., Oxford, 1936